জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
খণ্ড ১৫। সংখ্যা ২
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫

ISSN 2519-5816
DOI: doi.org/10.3329/jnujarts.v15i2.87973
Page: 1-13

ঢাকার নাগরিক জীবনের আধুনিকায়নে স্থানীয় ঐতিহ্যিক ব্যবস্থার প্রভাব অনুসন্ধান (১৮৬৪-১৯৪৭): প্রসঙ্গ পঞ্চায়েত প্রথা

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন*

Exploring the Impact of Local Traditional Systems on the Modernization of Civic Life in Dhaka (1864-1947): Context *Panchayet* System

Abstract

This article analyzes the role of organic and traditional institutions in the production of urban modernity in Dhaka. It examines how indigenous systems shaped the transformation of citizen life during the city's transition under colonial rule. The Panchayat system is employed as a critical example of a traditional institution that mediated social order and civic practices. While modernity is a contested and plural concept, colonial interventions significantly reconfigured Dhaka from a Mughal urban center into a British colonial town. However, this transformation did not follow a linear or uniform trajectory. Instead, traditional institutions continued to operate alongside colonial forms of governance. Urban historians conceptualize this process as "indigenous modernity," emphasizing the active role of local practices in shaping modern urban life. This article explores how the Panchayat system functioned within the colonial modernizing framework and contributed to the making of modern citizenship. It further examines the dynamics of duality, contestation, and negotiation between traditional authority and colonial modernity in shaping the everyday livelihoods of Dhaka's citizens.

মুখ্যশব্দ: আধুনিকতা, ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত প্রথা, ঢাকা শহর, নাগরিক জীবন

---

* Dr. Mohammad Jahangir Hussain, Professor, Department of Islamic History and Culture, Jagannath University, Dhaka; jht_ju2013@yahoo.com

ভূমিকা

আধুনিকতার প্রকৃত সংজ্ঞা স্থান ও কালভেদে বিবিধ আর বৈচিত্র্যময়। পনের-ষোল শতকে ইতালিকে কেন্দ্র করে ইউরোপে যে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সূচনা হয়, তার মাধ্যমে ইউরোপীয় সভ্যতা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণ করে। সাধারণত এই সময়কালকে পৃথিবীর ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনাকাল হিসেবে ধরা হয়। মানব সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় যুক্তিবাদ, বাস্তববাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ন্যায় উপাদান বা বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি- যা পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। এ সকল বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্যের বেড়াজাল ভেঙে শিল্প, সাহিত্য, সামাজিক প্রথাকে নতুনত্বের দিশায় ধাবিত করে। আবার প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পায়ন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের ফলে মানব জীবনে আসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। তবে এই পরিবর্তনের প্রভাব সর্বদা একরৈখিক ছিল না। উনিশ ও বিশ শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতের অন্যতম প্রদেশ হিসেবে বাংলায় যে আধুনিকতার জন্ম হয়, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ তাকে 'ইউরোপীয় আধুনিকতা'র (European Modernity)[১] প্রতিভূ বলে অভিহিত করেন। কেননা শাসকশ্রেণি 'সভ্যতার মিশন' (Civilizing Mission)[২] এর মাধ্যমে স্থানীয় বিধি-ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে এবং ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত ব্যবস্থাদি চালু করে। ব্রিটিশ শাসকগণের দ্বারা প্রবর্তিত এই সভ্যকরণ প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কেরি এ ওয়াট (Carey A. Watt)-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তার মতে,

> For the British Raj in India the civilizing mission meant many things, including bringing the benefit of British culture to the subcontinent in the form of free trade and capitalism as well as law, order and good government.[৩]

কেননা শাসকশ্রেণি উপনিবেশক ও উপনিবেশিত জনগোষ্ঠির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য খুঁজে বের করেন, যেখানে সভ্যতার বিচারে স্থানীয় বা উপনিবেশিত জনগণ ছিল ব্রিটিশদের তুলনায় এবং বৃহৎ পরিসরে ইউরোপীয় জনগণের তুলনায় নিম্নমানসম্পন্ন সভ্যতার ধারক। ফলে পিছিয়ে পড়া, তুলনামূলক অনুন্নত ও নিম্নমানসম্পন্ন জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য সভ্যতাকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনকে গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যকরণীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশিতদেরকে এক ধরনের 'নতুন ও উন্নত সংস্কৃতির' ঘেরাটোপে ফেলে তাদের অধীত সংস্কৃতিবাহী একটি সভ্য গোষ্ঠী তৈরি করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শাসকশ্রেণি ভূমি ও আইন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন, ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যম করে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন এবং দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটায়। তবে স্থানীয়রা আধুনিকতার নামে এই ধরনের ব্যবস্থাদি সর্বদা সাদরে গ্রহণ করেনি; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবস্থা তৈরি করে। এর সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ ইউরোপীয় আধুনিকতা এবং স্থানীয় ঐতিহ্যের মিলন ও বিরোধের সমন্বয়ে এক সমন্বয়ধর্মী আধুনিকতার জন্ম হয়। আধুনিকতার এ ধরনের সমন্বয়ধর্মী সাংস্কৃতিক রূপান্তরকে এন্থনি ডি কিং 'হাইব্রিড সংস্কৃতি' বা তৃতীয় সংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত করেন।[৪] তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দিল্লিতে যে নব্য আধুনিকতার জন্ম হয় তার পরিচয় চিহ্নিত করতে গিয়ে এই নামকরণটি ব্যবহার করেন। অপর নগর ঐতিহাসিক জ্যোতি হুসাগ্রাহার একে 'Indigenous Modernity' বা 'স্থানীয় আধুনিকতা' অভিধায় অভিহিত করেন।[৫] তার

মতে, উপনিবেশিত অঞ্চলের আধুনিকতা শাসক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠলেও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যেই ছিল এর মূল চালিকা শক্তি।

সাধারণত আধুনিকতার বিস্তারণ ঘটে শহর বা নগরকে কেন্দ্র করে। নগরের ইতিহাস যেহেতু নাগরিকের ইতিহাস—তাই নগরবাসীর আধুনিকায়নের ইতিহাস মূলত নগরের আধুনিকায়নের ইতিহাসকেই বিধৃত করে। তৎকালীন বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর ঢাকার নাগরিক জীবনের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। উনিশ-বিশ শতকের ঢাকার নগরায়ণকে আধুনিকায়নের সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যদিও শহরবাসী অনেকেই গ্রামীণ ঐতিহ্যকে লালন করত। এ ধরনের শহরবাসীকে নৃতত্ত্ববিদগণ 'Urban Villagers' আখ্যা দিয়ে থাকেন।[৬] ঢাকার শহুরে সম্প্রদায়ের স্থানিক ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী রংগলাল সেন ওয়েবারীয় ধারণা ব্যবহার করেন। তার মতে, স্বয়ংসম্পূর্ণ শহুরে সম্প্রদায়ের জন্য কয়েকটি স্থানিক বৈশিষ্ট্যের আবশ্যিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়, যেমন-

ক) একটি প্রাচীর খ) একটি বাজার গ) একটি আদালত, যার স্বায়ত্বশাসন আইন থাকবে ঘ) সংশ্লিষ্ট সভা-সমিতির একটি কাঠামো ঙ) আংশিক স্বায়ত্বশাসনমূলক একটি প্রশাসন, যেখানে শহরবাসী ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে।[৭]

ওয়েবারীয় ধারণা অনুযায়ী মুঘল আমলে ঢাকায় স্বয়ংসম্পূর্ণ শহুরে সম্প্রদায় গড়ে ওঠার জন্য বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য না থাকলেও ঔপনিবেশিক আমলে তা পরিমিত অবস্থায় বিকশিত হয়েছিল। তবে প্রাক-ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্যাদি আধুনিক শহুরে সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বিদ্যমান ছিল। রংগলাল সেন রাজধানী ঢাকার সমাজ কাঠামো সম্পর্কে বলেন, মুঘল আমলে সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকা প্রসিদ্ধি লাভ করলেও বাস্তবে এটি ছিল বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি বিশিষ্ট একটি জনপদ। উপমহাদেশের একটি প্রাচীন শহুরে সম্প্রদায় হিসেবে ঢাকা শহরে বিদ্যমান মহল্লাভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে তিনি ঢাকার অন্যতম সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতা হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৮] মূলত প্রাচীন এই ব্যবস্থাটির প্রভাব নগরবাসীর জীবনে ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। ঢাকার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় আধুনিক রীতি ও ব্যবস্থা একদিকে যেমন নাগরিক জীবনে পরিবর্তন এনেছিল অন্যদিকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও নগরবাসীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমান প্রবন্ধে ব্রিটিশ ঢাকার নাগরিক জীবনের আধুনিকায়নে পঞ্চায়েত প্রথার প্রভাব কতটুকু ছিল এবং এর প্রেক্ষিতে কিভাবে ঢাকার আধুনিকতা একটি 'স্থানীয় আধুনিকতা'র রূপ পরিগ্রহ করেছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা:

নগরসংস্কৃতি যেমন নাগরিক জীবনকে পরিচালিত করে, একইভাবে নগরসংস্কৃতি তৈরি হয় নাগরিকের জীবনাচরণের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। নগর ও নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্কই নগরের সার্বিক পরিকল্পনা, অবকাঠামোর উন্নয়ন ও পরিচালনা এবং শহরের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। ঔপনিবেশিক বাতাবরণে ঢাকার নাগরিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হলেও একটি স্থানীয় ঐতিহ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পঞ্চায়েত প্রথার প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং স্থানীয় ও ঐতিহ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি শুধু ব্রিটিশ আধিকারিদের নিকট শুধু গ্রহণযোগ্যই ছিল না, গুরুত্বপূর্ণও ছিল। অথচ ঢাকার নগরায়ণ ও নাগরিক জীবনের নানাবিধ দিক

সম্পর্কে গবেষণাকর্ম সম্পাদন হলেও ঢাকার নাগরিক জীবনে পঞ্চায়েত প্রথার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা অনুপস্থিত। এই প্রবন্ধ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, নগর পরিচালনায় আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা ও মহল্লাভিত্তিক প্রাচীন নগর পরিচালনা কাঠামো পঞ্চায়েত প্রথার কর্মপন্থা, কর্ম-পরিসর ও কর্মকাণ্ডের ধরন এবং নগরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিসরে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ক, সংলাপ ও বিরোধ ও সমন্বয়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করা; ইউরোপীয় ধারণা সম্বলিত আধুনিক নগর গঠনের ক্ষেত্রে নগর প্রশাসক, নব্য শিক্ষিত এলিট ও ব্যবসায়ীদের ভূমিকা এবং মহল্লা পঞ্চায়েতগণের পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে কী ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল এবং শহরের বিভিন্ন শ্রেণির জনসাধারণের উপর এর কতটুকু প্রভাব পড়েছিলো- তা অন্বেষণ করা। গবেষণার সময়কাল ১৮৬৪ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত নিধারণ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রথা ঢাকায় প্রচলিত একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। তবে এই প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ঠিক কখন এবং কেন হয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। ঢাকার নাগরিক জীবনের বহুবিধ কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানটির সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ শাসনাধীনে নগর পরিচালনার ও নাগরিক পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি আধুনিক মিউনিসিপালিটি স্থাপন করা হয় ১৮৬৪ সালে। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটলে ঢাকা নগরীর পরিচালনায় পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধিত হয় যা ছিল ব্রিটিশ ব্যবস্থা থেকে অনেকটাই আলাদা। ফলে, প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যেহেতু ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে পরিচালিত আধুনিক নগরে ঐতিহ্যিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোকপাত করা– তাই সময়কালটি এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের বিলুপ্তির সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে মূলত গুণগত পদ্ধতি (Qualitive method) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস ব্যবহার করে এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসসমূহ বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আলোচ্য সময়কালের (উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমভাগ) সিটি কর্পোরেশন রেকর্ড, মিউনিসিপাল রেকর্ড, পাবলিক হেলথ এন্ড সেনিটেশন ফাইলসমূহ, এডুকেশন ডেসপাসসমূহ, সরকারি প্রসিডিংস, সার্কুলারসমূহ, গ্যাজেটসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। আহসান মঞ্জিল যাদুঘরে ঢাকার নবাবদের রক্ষিত দলিলপত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত সরকারি প্রসিডিংস, গ্যাজেট ও সমকালীন পত্রিকাসমূহ প্রাথমিক উৎসের যোগান দিয়েছে। এছাড়া সমকালীন পত্রিকাসমূহ, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া, ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি, ঢাকা মহানগর সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা ও ঢাকার জন-জীবনের বিবিধ সমস্যা নিয়ে প্রকাশিত বিবৃতিসমূহ আলোচ্য প্রবন্ধকে তথ্যসমৃদ্ধ করেছে। তবে গবেষণার ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও এর যৌক্তিকতা নির্ণয় তথা কাঠামো বিন্যাসের জন্য দ্বৈতীয়িক উৎসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি একটি মৌলিক গবেষণা যা এই দুই ধরনের উৎসের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

আধুনিকতা, ঐতিহ্য ও নাগরিক জীবন

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যকার সম্পর্ক একদিকে সাংঘর্ষিক আবার অন্যদিকে সমন্বয়ধর্মী।ঐতিহ্য হলো মানুষের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি; প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি যা মূলত অঞ্চলভিত্তিক ও রক্ষণশীল। অন্যদিকে

আধুনিকতা হলো বিজ্ঞানমনস্কতা ও নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করার মানসিকতা। এটি বিশ্বজনীন, প্রগতিশীলতাকে ধারণ করে, পুরাতন ও ঐতিহ্যিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তন সাধনের মধ্য দিয়ে নতুনের দিশায় এগিয়ে যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, ঐতিহ্য অতীতের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে, আর আধুনিকতা ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে প্রায়শই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, কেননা আধুনিকতা প্রথাগত মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করে। তবে উভয়ের সমন্বয় ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। সভ্যতার বিকাশ ধারায় নগর বা শহরের সাথে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কেননা ঐতিহ্য ও আধুনিকতা হলো নাগরিক জীবনের মূল চালিকা শক্তি, আর নগর হলো নতুন প্রযুক্তি ও জীবনধারার বিকাশস্থল। গ্রামীন সমাজ সাধারণত ঐতিহ্যকে ধারণ করে আর নগর সমাজ শিক্ষা ও প্রযুক্তির উন্নয়নে মনোনিবেশ করে। তবে গ্রাম ও শহরের সম্পর্কের আলোকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, শহরবাসীর শেকড় গ্রামের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় নাগরিক জীবন গড়ে ওঠে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে। ফলে নাগরিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে।

ঢাকার নাগরিক জীবনের আধুনিকায়ন ও পঞ্চায়েত প্রথা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়কালকে ঢাকার নাগরিক জীবনের আধুনিকায়ণ প্রক্রিয়ার সূচনাকাল হিসেবে ধরা হলেও এর নগরায়ণের ইতিহাস প্রায় সাত শত বছরের পুরোনো। স্বাধীন সুলতানি বাংলার তৎকালীন রাজধানী ও গুরুত্বপূর্ণ শহর সোনারগাঁয়ের সাথে নৌপথে যোগাযোগের সুবিধা থাকায় ঢাকা একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র (ইকলিম) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬১০ সালে ঢাকা মুঘল বাংলা সুবার রাজধানী হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে এর নগরায়ণের বিকাশ তরান্বিত হয়। এ সময়ে নানা জাতির সমাগমে এটি একটি বৃহত্তর নগরীতে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ঢাকার আকার ও জনসংখ্যায় আসে ব্যাপক পরিবর্তন। ১৮৭৭ সালে লেখা ডব্লিও ডব্লিও হান্টার (W W Hunter) ঔপনিবেশিক ঢাকার ভৌগোলিক অবস্থান ও শহরের স্থানিক কাঠামোর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

> The principal town and civil station of the district as well as the headquarters of the commissioner of the division is the city of Dhaka, situated on the north bank of the Buriganga River […]. The city is bounded on the east by a low alluvial plain which extends to the Lakhmia river, and on the north and north-west by tract of jungle interspersed with Musalman cemeteries and deserted gardens, mosque and houses now in ruins. […] The town itself is built on the bank of the river, along which its streets, bazars, and lanes extend to a distance of four miles in length, and about a mile and quarter in breath.[৯]

তার বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, মুঘলদের অধীনে শহরটির বিস্তার ও উন্নয়ন ঘটেছিলো। এ সময়ে শহর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন ১ জন ফৌজদার ও ৬ জন আমিন। তাদের কাজে সহায়তার জন্য থাকত ৮০ জন পিয়ন, ৫০ জন ঘোড়সওয়ার এবং ৫০ জন বন্দুকধারী পাহারাদার।[১০] তারা শহরের অধিবাসীদের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকত। তাছাড়া কোতোয়ালের দায়িত্ব ছিল নগর ও নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান

করা। জনসাধারণের নাগরিক সুবিধাদি নিশ্চিত করার জন্য অর্থের যোগান আসতো বরাদ্দকৃত সরকারি ভূমি থেকে।[১১] মূলত মুঘল শাসনাধীনে ভারতের অন্যান্য শহরের মতো রাজধানী ঢাকার উন্নয়ন ও নাগরিকদের পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান ছিল। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানি লাভ করলে স্বল্প সময়ের মধ্যে তা ভেঙে পড়ে এবং ঢাকা বসবাস ও কর্মসংস্থানের জন্য একটি অনুপযুক্ত শহরে পরিণত হয়। এ সময়ে ঢাকার নাগরিকদের জন্য অপরিহার্য দুটি প্রতিষ্ঠান, যথা-কোতওয়াল এবং ফৌজদার পদ বিলুপ্ত করা হয়।[১২]

উনিশ শতকের ঢাকা ছিল বিভাগীয় কমিশনারের অধীনে পরিচালিত একটি বিভাগীয় সদর দপ্তর। ততদিনে সুবা বাংলার রাজধানীর জৌলুশ হারিয়ে ঢাকা পরিণত হয়েছিল একটি ছোট মফস্বল শহরে। তবে এই শতকেরই মাঝামাঝি থেকে রেলপথ স্থাপন, জলপথে স্টিমার সার্ভিস চালু হলে গ্রাম ও শহরের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, যার ফলস্বরূপ গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। ঢাকাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা কায়দার আধুনিক শিক্ষা, চিকিৎসাব্যবস্থা, বিচার ও পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে জনজীবনে দৃশ্যমান পরিবর্তনের সূচনা হয়। আধুনিক নাগরিক জীবনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় এ সকল সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ শহরে এসে বসবাস করতে শুরু করে। ফলে বিশ শতকের প্রথমার্ধ নাগাদ ঢাকা মধ্যবিত্তদের শহরে পরিণত হয়। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ব্যতিত এ সময়ে ঢাকায় বসবাসকারীদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল ইউরোপীয় প্রশাসকগণ এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত স্থানীয়রা, যেমন- উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি। এ সকল পেশাজীবীদের অর্থনৈতিক অবস্থাই তাদের জীবনমান ও সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করত।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগের ঢাকা ছিল মুঘল ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি মুসলিম শহর। এ সময়ে পেশাজীবী শ্রেণির পাশাপাশি সমাজে উচ্চ শ্রেণির মুসলিমদের বাস ছিল যারা উর্দু ও ফারসি ভাষায় কথা বলত। এদের বেশিরভাগই আঠারো শতকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পারস্য, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান থেকে এসে ঢাকায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল। কালের বিবর্তনে তারা এ অঞ্চলের স্থানীয় জনসাধারণের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। তারা ঢাকায় মূলত মহল্লাভিত্তিক সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে। তবে শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসীরা কুট্টি নামে পরিচিত ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল শিক্ষাবিহীন ও দরিদ্র। স্থানীয় বাসিন্দাদের অপর একটা অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। এরা ছিল মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। তাছাড়া ব্যবসায়িক কারণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত একটি ক্ষুদ্র অংশও ঢাকায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর এই সকল শ্রেণির প্রভাবও ছিল শক্তিশালী। শরীফ উদ্দিন আহমেদ তার *Dhaka A Study in Urban History and Development 1840-1921* গ্রন্থে উনিশ শতকে ঢাকায় বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার নাগরিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ঢাকার অধিবাসীদের এই অংশগুলো কিভাবে শাসকদের আনীত নতুন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সাথে প্রচলিত ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে ঢাকাকে একটি আধুনিক শহর হিসেবে তৈরি করতে তৎপর ছিল।

মূলত নগরায়ণ ও আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দৃশ্যমান পরিবর্তনের নিয়ামক ছিল এ সকল শ্রেণি-পেশার নাগরিকগণ। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষায়

শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণি ভারত ও ইংল্যান্ডের শহরগুলোর আধুনিক নাগরিক জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ঢাকাকে একটি আধুনিক সুবিধাসম্বলিত শহরে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা স্থানীয় মহল্লাভিত্তিক বসতি থেকে আলাদা হয়ে আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত পরিকল্পিত জায়গায় বসবাসে আগ্রহী ছিল। ফলে তাদের জন্য ১৮৮৫ সালে প্রশাসনের উদ্যোগে ওয়ারিতে গড়ে তোলা হয় ঢাকার প্রথম আবাসিক এলাকা। এই ভদ্রলোক শ্রেণির বেশিরভাগ ছিল গ্রামের বিত্তশালী কিংবা জমিদার পরিবারের সন্তান। আহমেদ তাদের এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেন, "These western educated outsiders transformed Dhaka, making it the intellectual and political capital of East Bengal".[১৩] নগর ও নাগরিক জীবনের উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টায় এই শিক্ষিত শ্রেণির সাথে যোগ দিয়েছিল স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণি এবং সর্বোপরি ঢাকার নবাব পরিবার। তবে ১৮৩০ এর দশকে ঢাকা কোম্পানি শাসকদের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও নগরবাসীর পরিষেবা প্রদান নিয়ে তাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ঢাকার নাগরিক জীবনের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সূচনা হয় ১৮৪০ সালে একটি মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠনের মাধ্যমে। শহরের ব্যবসায়ী ও এলিট শ্রেণির বাসিন্দা এবং প্রশাসকদের উদ্যোগে এই কমিটি গঠিত হয়। নতুন এই কমিটির কর্মপন্থা ও পরিধি মুঘলদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে ছিল অনেকটাই আলাদা। মুঘল ব্যবস্থার সাথে এর সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো এটি ছিল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।[১৪] তাছাড়া এই কমিটি গঠনের জন্য রাষ্ট্রীয় অনুমতি থাকলেও নগর উন্নয়নের জন্য ছিল না কোনো অর্থ বরাদ্দ।

পরবর্তীকালে উক্ত স্বেচ্ছাসেবী কমিটির কর্মতৎপরতা ও সরকারি উদ্যোগে ১৮৬৪ সালে ঢাকা মিউনিসিপালিটি নামে একটি নগর প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ঢাকার ইতিহাসে ছিল একটি মাইল ফলক। এর মাধ্যমে ঢাকার নাগরিক পরিষেবার কাজটি আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং এ কাজের জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থ বরাদ্দ ও জনবল নিযুক্ত হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক সক্ষমতা, লোকবল এবং কর্মকাণ্ড ছিল সীমাবদ্ধ। সাধারণত পয়োঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, রাস্তাঘাট মেরামত, স্বল্প পরিসরে শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং জন্ম-মৃত্যুর রেজিস্ট্রিকরণ সংক্রান্ত কাজগুলো মিউনিসিপালিটির মাধ্যমে সম্পন্ন হতো।[১৫] বলা বাহুল্য এ সকল পরিষেবা শহরের জনসাধারণের চাহিদার তুলনায় ছিল অপ্রতুল আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা প্রদান করা হতো সমাজের এলিট ও প্রভাবশালীরা যেখানে বসবাস করত, সেসব এলাকায়।[১৬] শহরের আদি বা পুরোনো এলাকাগুলো ছিল বরাবরের মতো অবহেলিত। এ প্রসঙ্গে ১৮৮১ সালের Bengal Times পত্রিকার মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য;

> Of the value is Native life, especially poor native life, in comparison to having the European throughfares of the town, streets over which roll the conveyances of the wealthy proprietors and drains that might offend delicate olfactories kept in order? Evidently, judged by the prescription of municipal committees, life in the lower grades of the Native Society has little or no value, and assuredly none as contrasted with the comfort of well-to-do community.[17]

নাগরিকসেবা প্রদানের সক্ষমতার অপ্রতুলতার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি শহরে বিদ্যমান আদি মহল্লা ভিত্তিক সমাজ কাঠামোগুলো পরিবর্তনে তেমন কার্যকর ছিল না। এর পেছনে দুই ধরনের কারণ

ছিল বলে মনে করা হয়। প্রথমত, একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ও মর্যাদাপূর্ণ শহর হিসেবে ঢাকায় যে অবকাঠামোগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তার বিপরীতে ঔপনিবেশিক শাসকগণ কর্তৃক আনীত ব্যবস্থা নগরবাসীর প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে সক্ষম ছিল না। দ্বিতীয়ত, নতুন ব্যবস্থাদির অনেক কিছুই নগর জীবনে প্রচলিত ঐতিহ্যিক নিয়ম-নীতির সাথে ছিল সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে শহরের পুরাতন প্রতিষ্ঠান হিসেবে মহল্লার[১৮] প্রকৃতি ও ক্রিয়াকর্ম ছিল আধুনিক পরিকল্পিত শহর ব্যবস্থার সাথে অনেক ক্ষেত্রেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা প্রত্যেক মহল্লার ছিল নিজস্ব প্রশাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ফলে ঢাকার নাগরিকদের একটা বিরাট অংশ তাদের নানাবিধ প্রয়োজনে মহল্লাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নির্ভরশীল ছিল।

ঢাকার ইতিহাসে মহল্লাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল অন্যতম। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অন্যতম প্রাচীন এই প্রথা ঢাকায়ও বিদ্যমান ছিল। মহল্লাভিত্তিক পঞ্চায়েত কাঠামো শহরটির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বিচার ও পুলিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সর্বদা তৎপর ছিল। শহরবাসীর একটা বড় অংশ ছিল এর উপর নির্ভরশীল। ঔপনিবেশিক বাতাবরণে ঢাকার নাগরিক জীবন এবং শহরের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নে নগর প্রশাসনের পাশাপাশি পঞ্চায়েত প্রথার সুদূরপ্রসারী ভূমিকা ছিল।

পঞ্চায়েত প্রথা মহল্লাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এই পরিষদের প্রধানের উপাধি ছিল 'মির-ই মহল্লা' যাকে পরবর্তিতে সর্দার বলা হতো। প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভবের সঠিক সময়কাল অজানা থাকলেও জেমস ওয়াইজ এবং খাজা মোহাম্মদ আজমের লেখা থেকে এ প্রথা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ব্রিটিশ চিকিৎসক জেমস ওয়াইজ ১৮৮৩ সালে লিখিত *Notes on Races, Castes and Trades of Eastern Bengal* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, প্রতিটি মুসলমান কাওম (সম্প্রদায় বা গোত্র) পঞ্চায়েতের অধীন ছিল। তারা সামাজিক ও বিচারিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন।[১৯] খাজা মোহাম্মদ আজমের মতে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করেছিলেন পূর্ববঙ্গের মুষ্টিমেয়, আদি ধর্মান্তরিত ও বহিরাগত মুসলিমরা। তাদের প্রতিবেশী হিন্দুরা বিভিন্নভাবে তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। সুতরাং সামাজিকভাবে নিজেদের রক্ষার জন্য তারা এ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।[২০] পঞ্চায়েত শব্দের অর্থ পাঁচ (পঞ্চ) জনের পরিষদ (আয়েত)। পঞ্চায়েত বলতে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত পরিষদকে বোঝায়। ঢাকার প্রতিটি মহল্লা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হতো।[২১] তবে এ ধরনের প্রথা এক সময় হিন্দুদের মধ্যেও ছিল এ অনুমান বাদ দেয়া যায় না, কেননা হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের বর্ণভিত্তিক পেশাগত দল ছিল এবং তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল। সে ব্যবস্থার অনুকরণেও মুসলমানরা তা নিজেদের জন্য গ্রহণ করে।[২২] উল্লেখ্য যে, প্রাচীন এই মহল্লাভিত্তিক পঞ্চায়েত প্রথাটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো বিদ্যমান। তবে খাজা আজম পঞ্চায়েত নামকরণের উৎস হিসেবে মুসলমানদের কাছে সংখ্যা 'পাঁচ' এর প্রতি গুরুত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেন।[২৩] তারা 'পাঞ্চ ই পাক' বা (Five Holly Persons) 'পাঞ্চ সামবে' (Thursday) বা সৌভাগ্যের দিন হিসেবে মনে করতেন। এই মতানুযায়ী মুসলমানরা পাঁচ সংখ্যাটিকে পবিত্র মনে করত বিধায় পঞ্চায়েত নামটি তারা গ্রহণ করেন।

খাজা আজম ঢাকার মহল্লা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার একটি বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তার মতে, ভাষা ও কৃষ্টির ভিত্তিতে ঢাকায় দুই ধরনের পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল। এর একটি 'বাইশ পঞ্চায়েত' ও অন্যটি 'বারো পঞ্চায়েত'। তার তথ্য অনুযায়ী, যে সকল মহল্লার অধিবাসীরা 'মুসলমানি বাংলা' বলতেন তারা ছিলেন 'বারো' পঞ্চায়েতের অধীন। অন্যদিকে যারা উর্দু ভাষাভাষী তারা 'বাইশ' পঞ্চায়েতের অধীন ছিলেন। তার মতে, বারো পঞ্চায়েতের অধীনে বসবাসকারীরা এ অঞ্চলের স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান, আর বাইশ পঞ্চায়েত বহিরাগত মুসলমানদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল।[২৪] পঞ্চায়েত গঠিত হতো মহল্লার পাঁচজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে। সম্মিলিতভাবে তারা পরিচিত হতেন 'পঞ্চ লায়েক বিরাদার' নামে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন সর্দার বা 'মির ই মহল্লা' যিনি এ ব্যবস্থার নেতৃত্বে থাকতেন। সাধারণত এ দায়িত্ব ছিল বংশানুক্রমিক। সর্দারের মৃত্যুর পর তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন 'মির ই মহল্লা' মনোনীত হতেন। তবে নির্বাচনের রীতিও প্রচলিত ছিল। সর্দার নির্বাচিত হওয়ার পর নায়েব সর্দার নির্বাচিত হতো। সর্দারের অনুপস্থিতিতে তিনি তার দায়িত্ব পালন করতেন।[২৫]

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল একটি স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান। এর ছিল একটি নির্দিষ্ট আর্থিক তহবিল। সমস্ত আয় হতো মহল্লা থেকেই; অর্থাৎ সালিশের বিচার, বিবাহ অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত দানের অর্থে তহবিল গঠিত হতো।[২৬] পঞ্চায়েতদের কার্যালয়টি 'বাঙলা ঘর' নামে পরিচিত ছিল। এই ঘরটি ছিল মহল্লার বিচারালয় এবং একইসাথে মক্তব বা বিদ্যালয়। কোনো কোন সময় এটি ছিল এলিট সমাজের আধুনিক ক্লাবের বিকল্প হিসেবে সাধারণ মানুষের পান-তামাক খাওয়া ও আড্ডার স্থান। পঞ্চায়েতের বাঙলা ঘরে শতরঞ্জি, চাদর, বাতি, ঝাড়বাতি, গুলাব-দান, সামিয়ানা ইত্যাদি থাকত। মহল্লাবাসীদের বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে এগুলো ধার দেয়া হতো।[২৭] ফলে দেখা যায়, আধুনিক নগর প্রশাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার একটি শক্তিশালী সামাজিক অবস্থান ছিল। বিশেষ করে ব্রিটিশ আইন ও বিচার ব্যবস্থা চালু থাকা স্বত্ত্বেও মহল্লাবাসী যে কোনো অপরাধের বিচার পেতে পঞ্চায়েতদের শরণাপন্ন হতো। বিচারে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিচার অমান্য করলে ছিল কঠোর ব্যবস্থা। 'নল-পানি বন্ধ' বা 'একঘরে' ব্যবস্থার মাধ্যমে মহল্লার সকলের সাথে যোগাযোগে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হতো। শুধু বিচার ব্যবস্থাই নয়, এলাকার কোনো ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলা, দুঃস্থদের সহায়তা করা, বেকারদের কর্মসংস্থান, এলাকার উন্নয়ন, ধর্মীয় উৎসব পালনে সহযোগিতা, মৃত ব্যক্তির সৎকার, বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিবাহের ব্যববস্থা করা- এ সকল কাজে পঞ্চায়েতগণ ভূমিকা পালন করতেন। এক কথায় বলা যায়, মহল্লাবাসীর সামগ্রিক জীবনের উপর তাদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর।

১৯০৪ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকার সর্দারদের সংগঠিত করেন এবং হেডমেন বা সর্দার প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন।[২৮] এর পেছনে ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।[২৯] কেননা সাধারণত মুসলমান সদস্যদের নিয়ে পঞ্চায়েত কমিটি গঠিত হলেও মহল্লায় বসবাসরত হিন্দু-মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও মহল্লার সকল কর্মকাণ্ডে সমান অংশীজন হিসেবে পরিগণিত হতো। ফলে সামাজিকভাবে প্রভাবশালী এই প্রতিষ্ঠানটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জরুরি ছিল। পঞ্চায়েত বা সর্দার প্রথার উপর নবাব পরিবারের এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকার সার্বিক অবস্থার উপর বিশেষ করে সমকালীন রাজনীতিতে গভীর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর নবাবগণ 'ইসলামিকরণের'[৩০] মাধ্যমে ঢাকার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে চাইলে পঞ্চায়েত পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন আসে। ১৯০৭ সালের পর থেকে ঢাকার নবাবগণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর

নিজেদের নিয়ন্ত্রণ তৈরি করেন এবং দুটি পঞ্চায়েতকে একত্রিত করেন। এ সময়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা একজন সর্দারের অধীনে নিয়ে আসেন ও সার্বিক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দেন। ১৯০৭ সালে খাজা আজম পঞ্চায়েতদের তত্ত্বাবধায়ক বা 'দায়েরা-ই-মুতিউল ইসলাম' হিসেবে নিয়োগপ্রপ্ত হন।[৩১] তিনি ছিলেন নবাব পরিবারের সদস্য এবং নওয়ার স্যার সলিমুল্লার ভগ্নীপতি।

ঔপনিবেশিক ঢাকায় আধুনিক নগর প্রশাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও মহল্লা ভিত্তিক পঞ্চায়েত প্রথাটি শহরের তৃণমূলে ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং এর কর্মকাণ্ড ছিল ব্যাপক বিস্তৃত। শহরের মুসলমান মহল্লা পরিচালনার জন্য এটি এক ধরনের সম্প্রদায়ভিত্তিক কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চায়েতগণ ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে সকল সদস্যদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। এর পাশাপাশি নগরীর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে বাসিন্দাদের কল্যাণ সাধনে ভূমিকা পালন করত। আধুনিক বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও সর্দারগণ বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। উল্লেখ্য যে, ঢাকা কোম্পানি শাসনের অধীনে চলে গেলে সর্বপ্রথম এখানে আপিল ও সার্কিট আদালতের সদর দপ্তর তৈরি হয়। রাজস্ব আদায়ের মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও একইসাথে জজ কোর্টে ফৌজদারি ও দিওয়ানি উভয় বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। কিন্তু পঞ্চায়েতের এলাকাধীন বাসিন্দারা খুব বিপদে না পড়লে আদালতে যেতেন না। স্থানীয় বিচার-আচার সাধারণত পঞ্চায়েত ও সর্দাররা সম্পন্ন করতেন। তাদের দেয়া রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাইকোর্ট পর্যন্ত সঠিক বলে গ্রহণ করতেন। ব্রিটিশ প্রশাসকগণ এই ঐতিহ্যকে বাধাগ্রস্ত করেননি। বরং দেখা যায় নগরের নানা উন্নয়নমূলক কাজে তাদের পরামর্শ গ্রহণ ও নিযুক্ত করা হতো। ১৮১৩ সালে শহরের নিরাপত্তা কর হিসেবে প্রচলিত চৌকিদারি কর আদায়ের কর্মসূচি মহল্লা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করার বিষয়ে আইন করা হয়।[৩২] মূলত সরকারি পুলিশ বাহিনীর আকার ছিল ক্ষুদ্র। তাদের সহায়তার জন্য স্থানীয়দের দ্বারা একটি সম্পূরক বাহিনী হিসেবে চৌকিদারদের নিয়োগ দেয়া হয়। এ ব্যবস্থা আধুনিক নগর প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় ব্যক্তি ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার প্রাথমিক চেষ্টা হিসেবে পরিগণিত।[৩৩] ১৮৪০ সালে মিউনিসিপাল কমিটি গঠিত হলে মহল্লাগুলির অবস্থানের ভিত্তিতে ঢাকাকে পাচঁটি এলাকায় বিভক্ত করে কমিটির স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়।[৩৪] কিন্তু এই সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সর্বদা বিদ্যমান ছিল না। বিশেষ করে, যখন নগর প্রশাসকগণ নানা ধরনের কর আদায়ের চেষ্টা করেন, তখন মহল্লার জনসাধারণের স্বার্থে পঞ্চায়েতগণ সম্মিলিতভাবে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। দেখা যায়, ১৮৬৪ সালে চৌকিদারি ট্যাক্সকে গৃহ ট্যাক্স এ রূপান্তর করা হয়, তখন তারা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। মহল্লা পঞ্চায়েত সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রশাসক ও নাগরিকদের মধ্যেও বিরূপ ধারণা পাওয়া যায়। তারা পঞ্চায়েতগণ কর্তৃক চৌকিদার ও পুলিশি ব্যবস্থা পরিচালনায় যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হন তাদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অত্যাচারী হিসেবে উল্লেখ করেন।[৩৫] ১৮৫৪ সালে মিউনিসিপাল সেক্রেটারি আলেকজান্ডার ফোবোর্স মন্তব্য করেন,

> The corruption of the Panchayets, the venality and extortion of the Duffadars, the venality and extortion of the Duffadars, the carelessness by which the tax has been allowed to fall into arrears and the rigour with which those arrears have been afterwards collected when almost forgotten by those who owed them, all these deep causes of discontent..[36]

পঞ্চায়েত প্রথাটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করলেও তৎকালীন ঢাকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা ছিল। বিশ শতকের প্রথমভাগে ঔপনিবেশিক শাসকদের গৃহীত বঙ্গভঙ্গ ও এর রদকল্পে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে শহরের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিবেশে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে শহরের বাসিন্দাদের একটা বিরাট অংশ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ে বিভাজিত হয়ে সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থান নেয়, এমনকি দাঙ্গার ঘটনাও ঘটে। ঢাকার মহল্লাগুলো হিন্দু পাড়া ও মুসলিম পাড়া হিসেবে নতুন পরিচয় পায়। পঞ্চায়েতগণ নিজ নিজ মহল্লাবাসীর পক্ষে কাজ করেন এবং ধর্ম ভিত্তিক বিভাজন থেকে নিজেদের দূরে রেখে বিভিন্ন বিপদ থেকে এলাকাবাসীকে রক্ষা করেন, নেতৃত্ব দান করেন। ঢাকার অধিবাসী সাইদ আহমদের লেখা থেকে জানা যায়, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময়ে মুসলমানদের নামে মামলা হলে বা গ্রেপ্তার করা হলে তাদের জামিনের জন্য নামী-দামি উকিল নিয়োগ করতেন কাদের মোল্লা নামক একজন প্রভাবশালী সর্দার।[৩৭] আবার কাগজীটোলা ও ফরাসগঞ্জ এলাকার সর্দার ছিলেন মাওলা বক্স। তার পঞ্চায়েত এলাকাটি ছিল হিন্দু প্রধান। ফলে তাকে একটি হিন্দু প্রধান এলাকার দাঙ্গা মোকাবেলা করতে হয়েছিল বেশ কয়েকবার।[৩৮] দাঙ্গা চলাকালে হিন্দুদের রক্ষার জন্য তাদের বাড়ি থেকে বের হতে দেয়া হতো না। কেননা, পঞ্চায়েতগণ মহল্লার অধিবাসীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতেন এবং এটা ছিল তাদের মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত।[৩৯]

তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ঢাকার পঞ্চায়েত প্রথার উপর কিছু বিরূপ প্রভাবও ফেলে এবং এর ফলে কিছু গুণগত পরিবর্তন ঘটে। প্রতিষ্ঠানটি এর স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সরে গিয়ে পক্ষপাতিত্বে জড়িয়ে পড়ে যা ছিল এর সর্বজনীন নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। তারা নগরের পৌর প্রশাসন জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি মিউনিসিপালিটির রাজনীতিতে জড়িয়ে যান। বিশেষ করে বিশ শতকের প্রথম থেকেই পৌর প্রশাসনের সদস্যপদ লাভের জন্য স্থানীয় ধনী ও শিক্ষিত শ্রেণি পঞ্চায়েতদের ব্যবহার করতে শুরু করেন। এ সময়ে জাতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিরোধিতা, দলাদলি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সামাজিক অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া সমাজের শিক্ষিত ও এলিট শ্রেণির চাহিদা অনুযায়ী মহল্লার বাইরে নতুন নতুন আবাসিক এলাকা তৈরি হতে থাকলে, মহল্লাভিত্তিক এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও কর্মপরিধিও কমে যেতে থাকে।

তথাপি তৃণমূলের এই প্রতিষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের অধিকার আদায়ের একটি ‘প্রতিযোগিতামূলক বিরোধী’ শক্তি (Contestational Bargaining group)। নাগরিক পরিষেবা ও অধিকার আদায়ের প্রশ্নে প্রশাসকদের সাথে সংলাপ, বিরোধ ও সমন্বয় প্রক্রিয়ায় পঞ্চায়েতগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করত। একইসাথে মহল্লাসমূহের স্থানিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি বিচারিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন ও সহযোগিতা প্রদান পঞ্চায়েতদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উপসংহার

ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইউরোপীয় আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে ঢাকা নগরীর ভৌত অবকাঠামো ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় শক্তি হিসেবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শহরবাসীর স্বার্থ ও নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল অক্ষুণ্ন রেখে প্রতিষ্ঠানটি ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে-বিপক্ষে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

বিভিন্ন আন্দোলনে ভূমিকা রাখা তথা ঢাকা নগরীর উন্নয়ন ও শহরবাসীর জীবনমানের উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল তৎপর। তাই ঢাকার নাগরিক জীবনের আধুনিকায়নের ইতিহাসের সাথে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ইতিহাস এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত।

তথ্যনির্দেশ

১ Jyoti Hosagrahar, *Indigenous Modernities: Negotiating architecture and Urbanism* (London: Routledge, 2005), p. 2

২ ঐতিহাসিকগণ civilizing mission- এর নানাবিধ সংজ্ঞায়ন করেছেন। হেরাল্ড ফিচার- টাইন ও মিশেল ম্যান সম্পাদিত (Harald Fischer- Tine and Michel Mann (eds.) *Colonialism as Civilizing Mission: Cultural Ideology in British India* (London & New York: Anthem Press, 2004, p.1-26) গ্রন্থে মিশেল ম্যান এর " Torchbearers Upon the Path of Progress": Britain's Ideology of "Moral and Meterial Progress" in India" শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধে Civilizing Mission এর সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য। তার সংজ্ঞা ও আলোচনা অনুযায়ী, "At its core, the civilizing mission was about morally and materially 'uplifting', 'improving' and later 'developing' the supposedly 'backward' or 'rude' people of India to make them more civilized and the British (and Europeans generally) at the top."

৩ Carey A. Watt and Mishel Mann (eds.), *Civilizing Missions in Colonial and Postcolonial South Asia: From Improvement to Development* (London-New York- Delhi: Anthem Press, 2011), p. 1

৪ Anthony D King, *Colonial Urban Development Culture, social power and environment* (London: Henley and Boston, 1976), p. 30

৫ Jyoti Hosagrahar, *Indigenous Modernities: Negotiating architecture and Urbanism* (London: Routledge, 2005), p. 2

৬ Herbert J. Gans, *The Urban Villagers: Groups and Class in the Life of Italian American,* New York, 1962, Introduction

৭ রংগলাল সেন, 'মুঘল আমল থেকে রাজধানী ঢাকার সমাজ ও সমাজ কাঠামো', আব্দুল মমিন চৌধুরী ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল, ১ম খন্ড (রাজনীতি সমাজ প্রশাসন)* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), পৃ. ১০০

৮ রংগলাল সেন, 'মুঘল আমল থেকে রাজধানী ঢাকার সমাজ ও সমাজ কাঠামো' তদেব, পৃ. ৯৭

৯ W W Hunter, *A Statistical Account of Bengal (Volume V)* (Trubner & Co. London: 1877), p. 65

১০ Hunter, *A Statistical Account,* p. 67

১১ Ibid

১২ James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca* (Calcutta: Huttmann, Military Orphan Press, 1840), p. 333

১৩ Sharif Uddin Ahmed, *Dhaka A Study in Urban History and Development 1840-1921, 3rd Revised edition* (Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2010), p.130

১৪ James Taylor, p. 333

১৫ বিস্তারিত, শরীফ উদ্দিন আহমদ, *Dhaka A Study in Urban History,* পূর্বোক্ত।
১৬ Sharif Uddin Ahmed, *ibid,* p. 201
১৭ *Bengal Times,* 1881, cited from Ahmed, *Dhaka A Study in Urban History*, p. 201
১৮ James Wise, *Notes on the Races, Castes and Tribes of Eastern Bengal* (London: 1883), p. 346
১৯ James Wise, Ibid, p. 347
২০ M. Azam, *The Panchayet System of Dacca* (Dacca, 1911), p.
২১ মো. আজিম বখশ, 'পুরান ঢাকার হারিয়ে যাওয়া পঞ্চায়েত ও সরদারি প্রথা', *ফয়জুন্নেছা কবীরউদ্দিন রহমানী স্মারক বক্তৃতা ২০২২* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২৩), পৃ. ১
২২ মুনতাসির মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ২০১১), পৃ. ২৮
২৩ M. Azam, *The Panchayet System of Dacca* (Dacca, 1911), pp. 10-11
২৪ *Ibid*, p. 13
২৫ নুরুদ্দীন ভূইয়া, 'ঢাকার সর্দারদের কথা', *স্মরণিকা ২০০১-২০০৪* (ঢাকা মহানগর সমিতি), পৃ. ৬২-৬৪
২৬ 'প্রাচীন ঢাকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা', 'ঢাকা : ইতিহাস ঐতিহ্য ও শিক্ষা', *সিদ্দিক খান রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি), পৃ. ৩৫৩
২৭ তদেব, পৃ. ৩৫৪
২৮ বিস্তারিত দেখুন-নুরুদ্দীন ভূইয়া, 'ঢাকার সর্দারদের কথা', পৃ. ৬২-৬৪
২৯ মুনতাসির মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১*, পৃ. ৩০
৩০ নবাব সলিমুল্লাহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন, মহররম, ফাতেহা-ইয়াসদাহাম প্রভৃতি পালনের জন্য অর্থের যোগান দিতেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহল্লার মুসলমানদের সংগঠিত করা ও অনুসারী বৃদ্ধি করা। বিস্তারিত: মুনতাসির মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১*, পৃ. ৩৫
৩১ নুরুদ্দীন ভূইয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২-৬৪
৩২ B.B. Misra, *The Central Administration of the East India Company 1773-1834,* Oxford University Press, 1959, p.364
৩৩ শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন '১৮৪০-১৯২১*, (ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি), পৃ. ১৭৯
৩৪ Ahmed, *Dhaka A Study in Urban History,* p. 36
৩৫ Ibid, pp. 36-37
৩৬ Ibid, p.159 (উদ্ধৃত)
৩৭ সাইদ আহমেদ, *ঢাকা আমার ঢাকা*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ১৪
৩৮ নুরুদ্দীন ভূইয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
৩৯ মুনতাসির মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬